প্রোফেসর শঙ্কু

প্রোফেসর শঙ্কু ও ভূত

সত্যজিৎ রায়

১০ই এপ্রিল

ভূতপ্রেত প্ল্যানচেট টেলিপ্যাথি ক্লেয়ারভয়েন্স-এ সবই যে একদিন না একদিন বিজ্ঞানের আওতায় এসে পড়বে, এ বিশ্বাস আমার অনেকদিন থেকেই আছে। বহুকাল ধরে বহু বিশ্বস্ত লোকের ব্যক্তিগত ভৌতিক অভিজ্ঞতার কাহিনী সেই সব লোকের মুখ থেকেই শুনে এসেছি। ভূত জিনিসটাকে তাই কোনওদিন হেসে উড়িয়ে দিতে পারিনি।

আমার নিজের কখনও এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়নি। চিনে জাদুকরের কারসাজিতে সম্মোহিত বা হিপনোটাইজড় হয়েছি, অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করেছি, গেছোবাবার মন্ত্রবলে জানোয়ারের কঙ্কালে রক্ত মাংস প্রাণ ফিরে আসতে দেখেছি। কিন্তু যে মানুষ মরে ভূত হয়ে গেছে, সেই ভূতের সামনে কখনও পড়তে হয়নি আমাকে।

এই অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যই বোধ হয় কিছুদিন থেকে ভূত দেখার ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে পারে।

এখানে অবিশ্যি কেবল রাসায়নিক প্রক্রিয়া বা যন্ত্রপাতিতে কাজ হতে পারে না। তার সঙ্গে চাই কনসেনট্রেশন। রীতিমতো ধ্যানস্থ হওয়া চাই—কারণ যে কোনও ভূত হলে তো চলবে না। বিশেষ বিশেষ মৃত ব্যক্তির ভুতকে ইচ্ছামতো আমার ঘরে এনে হাজির করে, তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করে, তারপর তাদের আবার পরলোকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হবে। যদি তাদের একেবারে সশরীরে এনে ফেলা যায়, যার ফলে তাদের আমরা স্পর্শ করতে পারি। তাদের সঙ্গে হ্যান্ড-শেক করতে পারি। তবেই না বিজ্ঞানের কৃতিত্ব!

গত তিন মাস পরিশ্রম, গবেষণা ও কারিগরির পর আমার নিও-স্পেকট্রোস্কোপ যন্ত্রটা তৈরি হয়েছে। এখানে স্পেকট্রো কথাটা স্পেকট্রাম থেকে আসছে না, আসছে স্পেক্টর অর্থাৎ ভূত থেকে। নিও-কারণ এমন যন্ত্র এর আগে আর কখনও তৈরি হয়নি।

যন্ত্রের বিশদ বিবরণ আমার খাতায় রয়েছে, তাই এ ডায়রিতে সেটা আর দিলাম না। মোটামুটি বলে রাখি-আমার মাথার মাপে একটি ধাতুর হেলমেট তৈরি করা হয়েছে। তার দুদিক থেকে দুটো বৈদ্যুতিক তার বেরিয়ে একটা কাচের পাত্রে আমার তৈরি একটা তরল সলিউশনের মধ্যে চোবানো দুটো তামার পাতের সঙ্গে যোগ করা হয়। হঠাৎ দেখলে অ্যাসিড ব্যাটারির কথা মনে হতে পারে।

সলিউশনটা অবশ্য নানারকম বিশেষ মালমশলা মিশিয়ে তৈরি। তার মধ্যে প্রধান হল শ্মশান-সংলগ্ন চিতার ধোঁয়ায় পরিপুষ্ট কিছু গাছের শিকড়ের রস।

এই সলিউশন গ্যাসের আগুনে গরম করলে তা থেকে একটা সবুজ রঙের ধোঁয়া বের হবে, খুব আশ্চর্যভাবে পাত্রের ওপরেই প্রায় এক মানুষ জায়গা নিয়ে কুণ্ডলী পাকাতে থাকে। ভূতের আবিভা়েব হওয়ার কথা সেই কুণ্ডলীর মধ্যেই।

আজ সকালে যন্ত্রটাকে প্রথম টেস্ট করলাম। ষোলো আনা সফল হয়েছি বলব না, এবং এই আংশিক সাফল্যের প্রধান কারণ হল আমার কনসেনট্রেশনে গলদ। ল্যাবরেটরিতে ঢোকার সময় দেখলাম বারান্দার কোণে আমার বেড়াল নিউটন এক থাবায় একটা আরশোলা মা়েরল। ফলে হল কী-হেলমেট পরে বসে ভূতের কথা ভাবতে গিয়ে কেবলই সেই আরশোলার নিস্প্রাণ দেহটার কথা মনে হতে লাগল।

সেই কারণেই বোধ হয় মিনিট পাঁচেক পরে স্পষ্ট দেখতে পেলাম ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে বিরাট এক আরশোলা তার শুড়গুলো যেন আমার দিকে নির্দেশ করে নাড়াচাড়া করছে।

প্রায় এক মিনিট ছিল এই আরশোলার ভূত। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। বুঝলাম আজ আর অন্য ভূত নামানোর চেষ্টা বৃথা।

কাল সকালে আরেকবার চেষ্টা করে দেখব। আজ সমস্ত দিনটা মনের ব্যায়াম অভ্যাস করতে হবে, যাতে কাল কনসেনট্রেশনে কোনও ত্রুটি না হয়।

www.bengaliebook.com

১১ই এপ্রিল

অভাবনীয়।

আজ প্রায় সাড়ে তিন মিনিট ধরে আমার পরলোকগত বন্ধু ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক আর্চিবল্ড অ্যাকরয়েডের সঙ্গে আলাপ হল। নরওয়েতে রহস্যজনকভাবে অ্যাকরয়েডের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কারণ পরে আমি জেনেছিলাম—এবং সেটা এর আগেই আমি ডায়রিতে লিখেছি। আজ সেই অ্যাকরয়েড অতি আশ্চর্যভাবে আমার সবুজ ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আবির্ভূত হলেন।

আশ্চর্য বলছি। এই জন্যে যে, অ্যাকরয়েডের বিষয় প্রায় পাঁচ মিনিট ধ্যান করার পর যে জিনিসটা প্রথম দেখা গেল ধোঁয়ার মধ্যে সেটা হল একটি নরকঙ্কাল-যার ডান হাতটা আমার দিকে প্রসারিত।

তারপর হঠাৎ দেখি সে কঙ্কালের চোখে সোনার চশমা। এ যে অ্যাকরয়েডেরই বাইফোকাল চশমা, সেটা আমি দেখেই চিনলাম।

চশমার পর দেখা গেল দাঁতের ফাঁকে একটা বাঁকানো পাইপ-অ্যাকরয়েডের সাধের ব্র্যায়ার।

তারপর পাঁজরের ঠিক নীচেটায় একটা চেনওয়ালা ঘড়ি। এও আমার চেনা।

বুঝতে পারলাম অ্যাকরয়েডের চেহারার যে বিশেষত্বগুলি আমার মনে দাগ কেটেছিল, সেগুলো আগে দেখা যাচ্ছে।

ঘড়ি, পাইপ ও চশমাসমেত কঙ্কাল হঠাৎ বলে উঠল—

হ্যালো, শঙ্কু!

এ যে স্পষ্ট অ্যাকরয়েডের গলা।—আর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সঙ্গেই সুটপরিহিত সৌম্যমূর্তি অ্যাকরয়েডের সম্পূর্ণ অবয়ব ধোঁয়ার মধ্যে প্রতীয়মান হল। তাঁর ঠোঁটের কোণে সেন

ছেলেমানুষি হাসি, মাথার কাঁচাপাকা চুলের একগোছা কপালের ওপর এসে পড়েছে। গায়ে ম্যাকিনটশ, গলায় মাফলার, হাতে দস্তানা।

আমি প্রায় হাত বাড়িয়ে অ্যাকরয়েডের হাতে হাত মেলাতে গিয়ে শেষ মুহূর্তে অপ্রস্তুত হয়ে নিজেকে সামলে নিলাম। করমর্দন সম্ভব ছিল না। কারণ যা দেখেছিলাম তা অ্যাক্রয়েডের জড়রূপ নয়, শূন্যে ভাসমান প্রতিবিম্ব মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য এই যে প্রেতিচ্ছায়ার কণ্ঠস্বর অতি স্পষ্ট। আমি কিছু বলার আগেই অ্যাকরয়েড তাঁর গভীর অথচ মসৃণ গলায় বললেন,-

তোমার কাজের দিকে আমার দৃষ্টি রয়েছে। যা করছ, তা সবই খেয়াল করি। তুমি তোমার দেশের মুখ উজ্জ্বল করছি।

উত্তেজনায় আমার গলা প্রায় শুকিয়ে এসেছিল। তবু কোনওরকমে বললাম, আমার নিও-স্পেকট্রোস্কোপ সম্বন্ধে তোমার কী মত?

সবুজ ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ভেতর থেকে মৃদু হেসে অ্যাকরয়েড বললেন আমার দেখা যখন তুমি পেয়েছ, তখন আর মতামতের প্রয়োজন কী? তুমি নিজেই জানো তুমি কৃতকার্য হয়েছ। যারা লোকান্তরিত, তারা মতামতের উর্ধ্বে। মানসিক প্রতিক্রিয়ার কোনও প্রয়োজন আমাদের জগতে নেই। চিন্তা ভাবনা সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সবই এখানে অবাস্তর।

আমি অবাক হয়ে অ্যাকরয়েডের কথা শুনছি, আর এরপর কী জিজ্ঞেস করব ভাবছি, এমন সময় একটা অদ্ভুত হাসির সঙ্গে সঙ্গেই বুদবুদের মতো অ্যাকরয়েড অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর তারপরেই ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা আমার দিকে এগিয়ে এল—আর আমি বুঝতে পারলাম যে আমার চেতনা লোপ পেয়ে আসছে।

যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমার চাকর প্রহ্লাদ আমার কপালে জলের ছিটা দিচ্ছে।

এই গরমে লোহার টুপি মাথায় পরে বসে আছ বাবু-বুড়ো বয়সে এত কি সয়?

www.bengaliebook.com

হেলমেটটা খুলে ফেললাম! বেশ ক্লান্ত লাগছে। বুঝলাম অতিরিক্ত কনসেনট্রেশনের ফল। কিন্তু অ্যাকরয়েডের প্রেতাত্মা যে আজ আমার ল্যাবরেটরিতে আবির্ভূত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে গেছে, তাতে কোনও ভুল নেই। আমার গবেষণা, আমার পরিশ্রম অনেকাংশে সার্থক হয়েছে। আশ্চর্য আবিষ্কার আমার এই নিও-স্পেকট্রোস্কোপ!

মনে মনে ভাবলাম-সামান্য শারীরিক গ্লানিতে নিরুৎসাহ হলে চলবে না। কাল আবার বসব এই যন্ত্র নিয়ে। ইচ্ছা হচ্ছে বিগত যুগের কিছু ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রেতাত্মার সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করে তাদের সঙ্গে কথা বলব।

১২ই এপ্রিল

অন্ধকূপ হত্যার আসল ব্যাপারটা জানিবার জন্য আজ ভেবেছিলাম সিরাজদ্দৌলাকে একবার আনব্য-কিন্তু সব প্ল্যান মাটি করে দিলেন। আমার প্রতিবেশী অবিনাশ চাটুজ্যে।

বৈঠকখানায় বসে সবেমাত্র কফি শেষ করে ন্যাপকিনে মুখ মুছছি, এমন সময় ভদ্রলোক হাজির।

অবিনাশবাবুর মতো অবৈজ্ঞানিক ব্যক্তি জগতে আর দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। ভদ্রলোকের জন্ম হওয়া উচিত ছিল প্রস্তরযুগে। বিংশ শতাব্দীতে তিনি একেবারেই বেমানান। আমার সাফল্যে ঔদাসীন্য ও ব্যর্থতায় টিটকিরি—এ দুটো জিনিস ছাড়া ওঁর কাছে কখনও কিছু পেয়েছি বলে মনে পড়ে না।

ঘরে ঢুকেই আমার সামনের সোফায় ধাপ করে বসে পড়ে বললেন, উশ্রীর ধারে ১৪

ঘোরাফেরা হচ্ছিল কী মতলবে?

উশ্রীর ধারে? আমি মাঝে মাঝে অবিশ্যি প্রাতভ্রমণে যাই। ওদিকটা, কিন্তু গত বিশ পচিশ দিনের মধ্যে যাইনি। সত্যি বলতে কী, বাড়ি থেকেই বেরোইনি। তাই বললাম-

www.bengaliebook.com

কবেকার কথা বলছেন?

আজকে মশাই, আজকে। এই ঘণ্টাখানেক হবে। ডাকালুম-সাড়াই দিলেন না।

সেকী-আমি তো বাড়ি থেকে বেরোইনি।

অবিনাশবাবু এবার হো হো করে হেসে উঠলেন। এ আবার কী ভিমরতি ধরল। আপনার!! অস্বীকার করছেন কেন? ওরকম করলে যে লোকে আরও বেশি সন্দেহ করবে। আপনার পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি হাইট, ওই টাক-ওই দাড়ি-গিরিডি শহরে এ আর কার আছে বলুন!

আমি যুগপৎ রাগ আর বিস্ময়ে কিছু বলতে পারলাম না! লোকটা কী? আমি মিথ্যেবাদী? আমি-ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু? আমার কিছু মূল্যবান ফরমুলা আমি কোনও কোনও অতিরিক্ত অনুসন্ধিৎসু বৈজ্ঞানিকের কাছে গোপন করেছি বটে কিন্তু উশ্রীর ধারে যাবার মতো সামান্য ঘটনা আমি অবিনাশবাবুর মতো নগণ্য লোকের কাছে গোপন করতে যাব কেন?

অবিনাশবাবু বললেন, শুধু আমি নয়। রামলোচন বাঁড়ুজ্যেও আপনাকে দেখেছেন, তবে সেটা উশ্রীর ধারে নয়-জজসাহেবের বাড়ির পেছনের আমবাগানে। আর সেটা আমার দেখার পরে। এইমাত্র শুনে আসছি। আপনি তাকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।

আমি চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক শুধু নিজে মিথ্যে কথা বলছেন না, অন্য আরেকজন প্রবীণ ব্যক্তিকেও মিথ্যেবাদী বানাচ্ছেন। এর কী কারণ হতে পারে তা আমি বুঝতে পারলাম না।

আমার চাকর প্রহ্লাদ অবিনাশবাবুর জন্য কফি নিয়ে এল। ভদ্রলোক ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলেন, হ্যাঁ হে পোল্লাদ-বলি, তোমার বাবু আজ সারা সকাল বাড়িতেই ছিলেন, না বেরিয়েছিলেন।

প্রহ্লাদ বলল, কাল অত রাত অবধি লাবুটেরিতে খুটুখাটু কইল্লেন, আর আজ আমনি সক্কালে বেইরে যাইবেন? বাবু বাড়িতেই ছিলেন।

এখানে একটা কথা বলা দরকার-আমি কাল সকালের পর আদৌ আমার ল্যাবরেটরিতে যাইনি। বিনা কারণে আমি কখনও ল্যাবরেটরিতে যাই না। আমার সারাদিনের কাজ ছিল কনসেনট্রেশন অভ্যাস করা—এবং সে কাজটা আমি করি আমার শোবার ঘরেই। রাত্রে নটার মধ্যে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম-উঠেছি। যথারীতি ভোর পাঁচটায়। অথচ প্রহ্লাদ বলে কিনা আমি ল্যাবরেটরিতে কাজ করেছি?

আমি প্রহ্লাদকে বললাম, আমি যখন কাজ করছিলাম, তখন তুমি আমাকে কফি দিয়েছিলে কি?

হাঁ বাবু-দিয়েছিলাম যে! তুমি অন্ধকার ঘরে খুঁটুর খুঁটুর করছিলে—আমি—

আমি প্রহ্লাদকে বাধা দিয়ে বললাম, অন্ধকার ঘর? তা হলে তুমি আমায় চিনলে কী করে?

প্রহ্লাদ একগাল হেসে বলল, তা আর চিনব না বাবু! চাঁদের আলো ছিল যে। মাথা হেঁট করে বসেছিলে। মাথায় আলো পড়ে চকচক...?

ঠিক আছে, ঠিক আছে।

অবিনাশবাবু একটা বিড়ি ধরিয়ে বললেন, সেই যে কী এক বায়স্কোপ দেখেছিলাম—একই মানুষ দু ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে—একই সময় এখানে ওখানে—আপনারও কি সেই দশা হল নাকি? তা কিছুই আশ্চর্য নয়। পইপই করে বলিছি ও সব গবেষণা ফবেষণার মধ্যে যাবেন না-ওতে ব্রেন অ্যাফেক্ট করে। গরিবের কথা বাসি হলে তবে ফলে কিনা!

আরও আধঘণ্টা ছিলেন অবিনাশবাবু। বুঝতে পারছিলাম। একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটানোর ফাঁকে ফাঁকে ভদ্রলোক আমার দিকে আড় চোখে লক্ষ রাখছিলেন। আমি আর

www.bengaliebook.com

কোনও কথা বলতে পারিনি, কারণ আমার মাথার মধ্যে সব কেমন জানি গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছিল।

বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে রামলোচনবাবুর বাড়ির দিকে গেলাম। ভদ্রলোক তাঁর গেটের বাইরে বাঁধানো রকটাতে বসে সুরেনডাক্তারের সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমায় দেখে বললেন, আপনি একটা হিয়ারিং এন্ড ব্যবহার করুন। এত ডাকলুম সকালে, সাড়াই দিলেন না। কী খুঁজছিলেন মিত্তিরের আমবাগানে? কোনও আগাছোটাগাছা বুঝি?

আমি একটু বোকার মতো হেসে আমতা আমতা করে আমার অন্যমনস্কতার একটা কাল্পনিক কারণ দিলাম। তারপর বিদায় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উশ্রীর ধারে গিয়ে বসলাম। সত্যিই কি আমার মতিভ্রম হয়েছে—মস্তিষ্কের বিকার ঘটেছে? এরকম ভুল তো এর আগে কখনও হয়নি। সাতাশ বছর হল গিরিডিতে আছি। নানারকম কঠিন, জটিল গবেষণায় তার অনেকটা সময় কেটেছে—কিন্তু তার ফলে কখনও আমার স্বাভাবিক আচরণের কোনও ব্যতিক্রম ঘটেছে—এরকম কথা তো কাউকে কোনওদিন বলতে শুনিনি। হঠাৎ আজ এ কী হল?

রাত্রে খাবার পর একবার ল্যাবরেটরিতে না গিয়ে পারলাম না।

নিও-স্পেকট্রোস্কোপিটাকে যেমন রেখে গিয়েছিলাম, তেমনই আছে। জিনিসপত্র বইখাতা, অন্যান্য যন্ত্রপাতি কোনওটা এতটুকু এদিক ওদিক হয়নি।

এই ল্যাবরেটরিতে কি এসেছিলাম কাল রাত্রে? আর এসেছি অথচ টের পাইনি? অসম্ভব!

ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলাম। দক্ষিণের জানোলা দিয়ে চাঁদের আলো টেবিলের ওপর এসে পড়ল। মনে গভীর উদ্বেগ নিয়ে আমি জানালার দিকে এগিয়ে গেলাম।

জানালা দিয়ে আমার বাগান দেখা যাচ্ছে। এই বাগানে রোজ বিকালে রঙিন ছাতার তলায় আমার প্রিয় ডেকচেয়ারে আমি বসে থাকি।

www.bengaliebook.com

ছাতা এখনও রয়েছে। তার তলায় চেয়ারও। সে চেয়ার খালি থাকার কথা-কিন্তু দেখলাম তাতে কে জানি বসে রয়েছে।

আমার বাড়িতে আমি, প্রহ্লাদ ও আমার বেড়াল নিউটন ছাড়া আর কেউ থাকে না। মাথা খারাপ না হলে প্রহ্লাদ কখনও ও চেয়ারে বসবে না।

যে বসে আছে সে বৃদ্ধ। তার মাথায় টাক, কানের দুপাশে সামান্য পাকা চুল, গোঁফ ও দাড়ি অপরিচ্ছন্ন ভাবে ছাঁটা। যদিও সে আমার দিকে পাশ করে বসে আছে এবং আমার দিকে ফিরে চাইছে না তাও বেশ বুঝতে পারলাম যে তার চেহারার সঙ্গে আমার চেহারার আশ্চর্য মিল।

এরকম অভিজ্ঞতা আর কারুর কখনও হয়েছে কি না জানি না। যমজ ভাইয়ের মধ্যে নিজের প্রতিরূপ দেখতে মানুষ অভ্যস্ত, কিন্তু আমার-যমজ কেন-কোনও ভাইই নেই! খুড়তুতো ভাই একটি আছেন—তিনি থাকেন বেরিলিতে—এবং তিনি লম্বায় ছফুট দুইঞ্চি। এ লোক তবে কে?

হঠাৎ মনে হল—শহরের কোনও ছেলেছোকরা আমার ছদ্মবেশ নিয়ে আমার সঙ্গে মস্করা করছে না তো?

তাই হবে। তা ছাড়া আর কিছুই নয়। বারগাণ্ডায় এক শখের থিয়েটারপাটি আছে। তাদের দলের কেউ নিশ্চয় এই প্র্যাকটিক্যাল জোকের জন্য দায়ী।

অপরাধীকে হাতেনাতে ধরব বলে পা টিপে টিপে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দা পেরিয়ে বৈঠকখানার দরজা দিয়ে সোজা বাগানের দিকে এগিয়ে গেলাম।

কিন্তু ব্যর্থ অভিযান। গিয়ে দেখি চেয়ার খালি। ক্যানভাসে হাত দিয়ে দেখি সেটা তখনও গরম রয়েছে। অর্থাৎ অল্পীক্ষণ আগেই কেউ যে সে চেয়ারটায় বসেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু চারিদিকে চেয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই। জ্যোৎস্নার আলোতে

আমার বাগানে গা ঢাকা দিয়ে থাকার কোনও উপায় নেই, কারণ একটি মাত্র গোলঞ্চ গাছের গুড়ির পিছনে ছাড়া লুকোবার কোনও জায়গা নেই।

তা হলে কি আমার দেখবার ভুল? কিন্তু অবিনাশবাবু, রামলোচনবাবু-এর তবে কাকে দেখলেন!

শোবার ঘরে ফিরে এসে অনুভব করলাম আমার উদ্বেগ আরও দ্বিগুণ হয়ে গেছে। আজ রাত্রে ঘুমের ওষুধ না খেলে ঘুম হবে না।

১৪ই এপ্রিল

ডবল শঙ্কুর রহস্যের যে ভাবে সমাধান হল, তার তুলনীয় কোনও ঘটনা আমার জীবনে আর কখনও ঘটেনি।

গত দুদিন আমাকে দেখতে পাওয়ার ভয়ে আমি ঘর থেকে বেরোইনি। যদি ভুল করে বা নিজের অজ্ঞাতসারে কখনও বেরিয়ে পড়ি, তাই প্রহ্লাদকে বলেছিলাম। আমার শোবার ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে তার গায়ের সঙ্গে একটা ভারী টেবিল লাগিয়ে দিতে। সকাল বিকালের কফি, আর দুপুর ও রাত্রের খাবার প্রহ্লাদ নিজেই টেবিল সরিয়ে দরজা খুলে ঘরে এনে দিয়েছে, খাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থেকেছে আর খাওয়া হলে পর দরজা বন্ধ করে বাইরে থেকে টেবিল ঠেলে দিয়ে গেছে।

তা সত্ত্বেও প্রহ্লাদ দুদিনই খবর এনেছে যে লোকে নাকি আমায় শহরের এখানে সেখানে দেখতে পেয়েছে। উশ্রীর আশেপাশেই বেশি। আর যাঁরা আমায় দেখেছেন তাঁদের সকলেরই ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, তাই আমি তাঁদের ডাকে সাড়া দিচ্ছি না। সুরেনাডাক্তার নাকি কাল বিকালে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই আমায় পরীক্ষা করতে এসেছিলেন। প্রহ্লাদ বলে দিয়েছিল বাবু ঘুমোচ্ছেন, দেখা হবে না।

আজ আর ঘরে বন্দি থাকতে না পেরে প্রহ্লাদকে ডেকে টেবিল সরিয়ে একেবারে সটান ল্যাবরেটরিতে গিয়ে হাজির হলাম।

www.bengaliebook.com

আমার চেয়ার, আমার টেবিল, আমার নতুন যন্ত্র, বৈদ্যুতিক তার, সলিউশনের পাত্র, খতাপত্র, সব যেমন ছিল তেমনই আছে।

খালি চেয়ারটা দেখে লোভ হল। গিয়ে বসলাম। তারপর হাত বাড়িয়ে হেলমেটটা নিয়ে মাথায় পারলাম। বোতলের মধ্যে সলিউশন ছিল, তার খানিকটা বিকারে ঢালিলাম। তারপর বানার জ্বালিয়ে বিকারটা আগুনের শিখার ওপর রাখলাম।

সলিউশন থেকে সবুজ ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করল।

হেলমেটটা মাথায় পরে বৈদ্যুতিক তারদুটো বিকারে চোবানো তামার পাতের সঙ্গে যোগ করে দিলাম। তারপর ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মাঝখানে দৃষ্টি রেখে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার হতভাগ্য নবাব সিরাজদ্দৌলার ধ্যান করতে করতে একেবারে তন্ময় হয়ে গেলাম।

ক্রমে কুণ্ডলীতে একটা নরকঙ্কালের আভাস দেখা গেল। সে কঙ্কাল স্পষ্ট হওয়ামাত্র বুঝতে পারলাম তার একটা বিশেষত্ব এই যে তার অস্তিত্ব কেবল মাথার খুলি থেকে পাঁজর অবধি। পাঁজরের নীচে কিছু নেই।

আশ্চর্য। এরকম হল কেন?

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল। কঙ্কালের মাথার জরির কাজ করা পাগড়ি। তারপর তার দুই কানের লতিতে দুটো জ্বলজ্বলে হিরা।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল ছেলেবেলায় ইতিহাসের বইয়েতে সিরাজদ্দৌলার যত ছবি দেখেছি, তার সবই হল আবক্ষ প্রতিকৃতি। আমার মনে এতকাল তার এই ছবিটাই ছিল– তাই ভূত হয়েও সে এইভাবেই দেখা দিচ্ছে।

www.bengaliebook.com

চোখের কোটরে সবেমাত্র একটা মণির আভাস পেতে শুরু করেছি, এমন সময় একটা অদ্ভুত অট্টহাস্যে আমার ধ্যান ভঙ্গ হল আর তার পরমুহুর্তেই ধোঁয়ার ভিতর থেকে সিরাজদ্দৌলার আবক্ষ কঙ্কাল অন্তর্হিত হল।

তারপর সবুজ ধোঁয়ার আবরণ ভেদ করে আমার টেবিলের দিকে এগিয়ে এল—একি আয়নায় আমারই প্রতিবিম্ব, না। অন্য কোনও মানুষ? মানুষে মানুষে এমন হুবহু সাদৃশ্য সম্ভব তা আমি জানতাম না।

কিন্তু আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে প্রতিবিম্বের ধারণা অচিরেই মন থেকে দূর হল। আমার চোখের দিকে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আগন্তুক বললেন, ত্রিলোকেশ্বর, তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তুমি আমার অনেক দিনের বাসনা চরিতার্থ করেছ।

আমি কোনওমতে ঢোক গিলে বললাম, আপনি কে?

আগন্তুক বললেন, বলছি। ধৈর্য ধরে। উশ্রীর ধারেই ছিল আমার সাধনার স্থান। গোলকবাবার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ষোলো বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে এখানে চলে আসি। একবার ধ্যানস্থ অবস্থায় প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টিতে ব্রহ্মতালুতে শিলার আঘাতে আমার মৃত্যু হয়।

মৃত্যু!

মৃত্যু। তারপর অনেকবার ইচ্ছা হয়েছে। এখানে ফিরে আসি। কিন্তু আমার একার পক্ষে সম্ভব ছিল না সশরীরে অবতীর্ণ হওয়া। তোমার বিজ্ঞান ও আমার তন্ত্রের সংযোগে আজ সেটা সম্ভব হয়েছে। তুমি প্রথম দিন ধ্যানস্থ হবার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আমি এসেছি। কিন্তু তখনই তোমাকে দেখা দিইনি, কারণ আমার অন্য কাজ ছিল। অকস্মাৎ মৃত্যুর ফলে আমার যোগসাধনার কিছু সরঞ্জামের কোনও ব্যবস্থা করে যেতে পারিনি। অথচ অনুপযুক্ত লোকের হাতে পড়লে অনিষ্টের সম্ভাবনা। তাই একদিন অনুসন্ধানের পর সেগুলি পুনরুদ্ধার করে আজ সকালে উশ্রীর জলে নিক্ষেপ করেছি। আর ভয় নেই। ...

কিন্তু আপনি কে সেটা জানলে...

বলছি। আগে কাজের কথা। তুমি সব মেচ্ছের ধ্যান করছ, তাদের প্রেতাত্মা জড়রূপ ধারণ করতে অক্ষম, কারণ, প্রথমতঃ আমার সাধনা তাদের অনায়ত্ত; দ্বিতীয়তঃ-তোমার সঙ্গে তাদের রক্তের সম্বন্ধ নেই।

রক্তের সম্বন্ধ?

আপনার সঙ্গে কি আমার...

হ্যাঁ। আছে। আমি হলাম তোমার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ঈশ্বর বটুকেশ্বর শঙ্কু। জন্ম ১০৫৬ সন, মৃত্যু ১১৩২ সন। এসো, তোমার করমর্দন করি।

আমার অবিকল অবয়বধারী পূর্বপুরুষ তাঁর ডানহাত আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি সেটা ধরতেই একটা শিহরনের সঙ্গে অনুভব করলাম তার তীব্র, অস্বাভাবিক শৈত্য।

বটুকেশ্বর হেসে উঠলেন, ঠাণ্ডা লাগছে, না? তবে চলি।

তারপর আমার হাত ছেড়ে দিয়ে একটা ছোট্ট লাফে বটুকেশ্বর ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করলেন। কয়েক মুহুর্তের মধ্যেই তাঁর দেহ কঙ্কালে পরিণত হল। সে কঙ্কাল অদৃশ্য হবার আগে মাথা হেঁট করে দেখিয়ে দিল–ব্রহ্মতালুর জায়গায় একটা ফুটো।

***

জড়ভূতের সাক্ষাৎ পাওয়াতে অশরীরী ভূত সম্পর্কে আর বিশেষ কৌতুহল রইল না–তাই বটুকেশ্বর অন্তধান হবার কিছু পরেই নিও-স্পেকট্রোস্কোপটা আলমারিতে তুলে রেখে দিলাম। সত্যি বলতে কী, ধ্যানের ব্যাপারে মানসিক পরিশ্রমটাও যেন একটু বেশি হয়ে পড়ছিল।

www.bengaliebook.com

আমি বৈঠকখানায় বসে নিউটনকে নিয়ে একটু তামাসা করছি, এমন সময় অবিনাশবাবু এসে হাজির।

তাঁকে দেখেই বুঝলাম তিনি বেশ উদ্বিগ্ন!

সোফায় বসে মিনিটখানেক কথা না বলে মেঝের দিকে ভ্রুকুটি করে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, আমার ভাইপো শিবুকে চেনেন তো?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

অবিনাশবাবু বললেন, সে ছোকরার ছবি তোলার বাতিক আছে। তা কদিন থেকেই তো আপনাকে এখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে, অথচ আপনি বলছেন বাড়ি থেকে বেরোননি, তাই–মানে, আপনাকে একটু জব্দ করার মতলবেই আর কী–শিবু সেদিন করেছে কী, ক্যামেরা নিয়ে উশ্রীর ধারে গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে আছে। তারপর যেই আপনাকে দেখেছে।

বাঃ। এনেছেন সে ছবি।

আনিব কী মশাই? শুধু বালি আর জল আর পাথর!! অথচ ওই পাথরের ধারেই ছিলেন আপনি। কিন্তু ছবিতে নেই–ভ্যানিস!

আমি একটু হেসে বললাম, আসলে কী জানেন অবিনাশবাবু? ওটা আমি ছিলাম না। ছিলেন আমার...পূর্বপুরুষের ভূত। আসুন, একটু কফি খান। প্রহ্লাদ!

শারদীয়া আশ্চর্য। ১৯৬৬

www.bengaliebook.com